# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১৩ সংখ্যা | ১১ - ১৭ নভেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১


## মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

*৭ নভেম্বর মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৬তম দিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে রুশ বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন ও সমাজতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী কমরেড স্ট্যালিনের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ*

## কলমকে বড় ভয় শাসকদের

সম্প্রতি হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে 'চিন্তন শিবির'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বন্দুকধারী মাওবাদীদের পাশাপাশি প্রতিবাদী কলমধারীদেরও নির্মূল করার কথা বলেছেন। বলেছেন, এইসব বিশিষ্ট জনেরা দেশের যুবসমাজকে বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী করছেন। এর ফলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

এর আগেও প্রধানমন্ত্রী সরকারের সমালোচকদের টুকরে টুকরে গ্যাং, আন্দোলনজীবী, শহুরে নকশাল প্রভৃতি তকমা দিয়ে তাঁদের দমন করার কথা বলেছেন। এখন আবার কলমধারীদের কথা জোরের সঙ্গে বললেন এবং তা বললেন সব রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, ডিজিপি, গোয়েন্দাবাহিনীর শীর্ষকর্তা প্রভৃতি প্রশাসনের মাথাদের সঙ্গে বৈঠকে। ইঙ্গিত স্পষ্ট, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই নয়, রাজ্যগুলিও যেন একই ভাবে সমালোচকদের দমনের কাজে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ নাগরিক সমাজকে লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিলেন কেন?

জাতীয় এবং আঞ্চলিক বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলি যখন পুঁজির স্বার্থরক্ষায় পুঁজিপতি শ্রেণির সামনে নিজেদের আভূমি নত করে ফেলেছে তখন দেশে নাগরিক সমাজের ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশের মানুষ তাঁদের প্রতিবাদী ভূমিকা দেখেছে এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলনে, দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে। পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে প্রতিবাদী কৃষকদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন সমাজের অগ্রণী এই অংশটি। কংগ্রেসের মনমোহন সিংহ সরকারের আমলে দুর্নীতিতে যখন সরকার ও প্রশাসন আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে দিল্লিতে আন্না হাজারের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আবার বিজেপি ঘনিষ্ঠ ধর্মোন্মাদদের হাতে প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকদের হত্যা ও গো-রক্ষার নামে সংঘবদ্ধ নরহত্যার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে খেতাব ও পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছিল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

## চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের প্রতি
# সংহতি এস ইউ সি আই (সি)-র

*আন্দোলনকারীদের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন কমরেড তরুণ নস্কর। ৪ নভেম্বর*

শিক্ষক চাকরি প্রার্থীদের অবস্থান বিক্ষোভের ৬০০তম দিনে আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানাতে ৪ নভেম্বর এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য কমিটির ডাকে পদযাত্রা ধর্মতলার লেনিন মূর্তি থেকে শুরু হয়ে গান্ধী মূর্তির অবস্থানস্থলে যায়।

আন্দোলনের নেতাদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন প্রাক্তন বিধায়ক, দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। শিক্ষক প্রার্থীদের এই দীর্ঘ অনড় আন্দোলনের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, মেধাতালিকাভুক্ত সকল যোগ্য প্রার্থীকে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে, সমস্ত শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, ঘুষের মাধ্যমে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের বরখাস্ত করে প্রাপ্ত বেতন ফেরত দিতে বাধ্য করতে হবে এবং সমগ্র দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, অফিসার থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিচারপতি এই দুর্নীতির পিছনে যে মাথার কথা বলেছেন তাকেও খুঁজে বের করতে হবে।

মিছিলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ অশোক সামন্ত ও দেবাশিস রায় এবং রাজ্য কমিটির সদস্য রতন কর্মকার, তপন সামন্ত, জৈমিনী বর্মন, অশোক দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

## কেরালায় মৎস্যজীবীদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে
# আদানির স্বার্থরক্ষায় একজোট সিপিএম-বিজেপি

কেরালায় শুরু হয়েছে এক অসম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের একদিকে রয়েছে দেশের সবচেয়ে ধনী পুঁজিপতি আদানি, যার পিছনে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের সিপিএম সরকার। উল্টোদিকে বাসভূমি ও জীবন-জীবিকা হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত হাজার হাজার মৎস্যজীবী সাধারণ মানুষ, পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীরা।

কেরালার ভিজিঞ্জামে আদানি গোষ্ঠী গড়তে চলেছে বিশালাকার 'ট্রান্সশিপমেন্ট কন্টেনার টার্মিনাল'। ২০১৫ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন তৎকালীন ইউডিএফ সরকারের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে রাজধানী তিরুবনন্তপুরমের ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে সমুদ্র-উপকূলবর্তী ভিজিঞ্জামে শুরু হয়ে গেছে এই বিশেষ বন্দর গড়ার কাজ, যেখানে যাত্রাপথের মাঝেই এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে মালপত্র স্থানান্তরিত করা হবে। পিপিপি মডেলে তৈরি হতে চলা ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের জন্য বিপুল পরিমাণ জমি লাগবে, যার পরিমাণ ৪৫০ হেক্টর (১ হেক্টর মানে ১০ হাজার বর্গমিটার)। এছাড়াও আদানির দখলে চলে যাবে তীরভূমি থেকে সমুদ্রের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত ১২০ হেক্টর জলভাগ এবং তার নিচে থাকা সমুদ্রতল। ইতিমধ্যেই এই বিপুল পরিমাণ জমি আদানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছে সিপিএম সরকার।

কেরালার দক্ষিণপ্রান্তে ভিজিঞ্জাম এলাকাটি বহু বছর ধরে মৎস্যজীবীদের বাসস্থান। এখানকার গ্রামগুলিতে বাস করেন হাজার হাজার

*সাতের পাতায় দেখুন*

*মৎস্যজীবীদের সমুদ্রপথ অবরোধ*

# সেতু দুর্ঘটনায় বেরিয়ে পড়ল ভাইব্র্যান্ট গুজরাটের আসল চেহারা

৩০ অক্টোবর গুজরাতের মোরবীতে মাচ্ছু নদীর উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল ব্রিটিশ আমলের ঝুলন্ত কেবল ব্রিজ। সরকারি হিসাবে ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ৪৮ জনই শিশু। আহতের সংখ্যা অন্তত ১৮০ জন। আশঙ্কা যে, এখনও মাচ্ছু নদীর জল-কাদায় আরও বহু দেহ আটকে রয়েছে।

ব্রিজ মেরামতির ঠিকাদার সংস্থার ম্যানেজার আদালতে জানিয়েছেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ব্রিজ ভেঙেছে'। সরকারের কর্তারা অভিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থার মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের না করে কার্যত এই বক্তব্যেই সীলমোহর দিয়ে দায় সারছেন। মোরবীর বাতাস আজও ভারী হয়ে আছে স্বজন হারানো মানুষের কান্নায়। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি নিছক দুর্ঘটনা?

**বেসরকারি কোম্পানিকে বরাত**

বিজেপি শাসিত গুজরাটের মোরবীর মিউ নিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শীর্ষকর্তারা এহেন পুরনো সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের বরাত দেয় 'ওরেভা' নামে এক বেসরকারি সংস্থাকে। যারা মূলত ঘড়ি, সিএফএল বাল্ব, ই-বাইক, ক্যালকুলেটর বা মশা মারার র‍্যাকেট তৈরির কোম্পানি। ব্রিজ তৈরি বা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। এর জন্য কোনও সরকারি টেন্ডারও ডাকা হয়নি। কেন, কার স্বার্থে এই বেনিয়ম?

ওরেভা কোম্পানি আবার দেবপ্রকাশ সলিউশন নামে এক সংস্থাকে সাব কন্ট্রাক্ট দেয়। ঠিক ছিল, আট থেকে বারো মাস সেতুটি বন্ধ থাকবে। কিন্তু সাত মাসের মাথায় ২৪ অক্টোবর গুজরাটি নববর্ষের দিন সেতুটি জনগণের পারাপারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তার দু'দিন আগে সাংবাদিক বৈঠক করে 'ওরেভা'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়সুখভাই পটেল জানিয়েছিলেন, সেতু মেরামতে খরচ হয়েছে ২ কোটি টাকা। প্রশ্ন উঠছে, প্রায় দেড়শো বছর আগে যে সেতু নির্মাণে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল, সেই সেতুর আমূল সংস্কার মাত্র ২ কোটি টাকায় হল কী করে? এখন সরকারি আমলারাও বলছেন, মেরামতির পরও দেখা গেছে ব্রিজটাকে ঝুলন্ত রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুরনো জং ধরা তারগুলি পাল্টানোর পরিবর্তে তাতে রং করেই কাজ সেরেছে ঠিকাদার সংস্থা। শুধু তাই নয়, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, ২ কোটির বদলে প্রকৃত খরচ হয়েছে খুব বেশি হলে ১২ লক্ষ টাকা। স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ দানা বাঁধছে, তবে সরকারি কর্তা এবং শাসকদলের নেতাদের সাথে কাটমানির ব্যবস্থা ছাড়া এমন কাজ সম্ভব? 'ইডি', 'সিবিআই' কি তবে এক্ষেত্রেও আসরে নামবে? না কি খাঁচার তোতার ভূমিকাতেই থাকবে?

প্রশ্ন উঠছে, নির্ধারিত সময়ের আগে কেন তড়িঘড়ি সেতু খুলে দেওয়া হল? নববর্ষ উপলক্ষে ভিড় হলে বেশি টিকিট বিক্রি হবে, আর বিধানসভা নির্বাচনে ব্রিজ মেরামতির কৃতিত্ব ছড়িয়ে ভোটে ফায়দা তোলা যাবে— এই হিসাব করেই কি নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে সেতু খুলে দেওয়া হয়েছে? ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়াই এই সেতুটি জনগণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় পুর কর্পোরেশনের চিফ এজিকিউটিভ সন্দীপ সিং জালা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ওরেভা কোম্পানি ব্রিজটি নতুন করে খোলার কথা পৌরসভাকে জানায়নি পর্যন্ত। এই দাবি যদি সত্য হয়, তবে সরকারি বরাত পাওয়া একটা বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষে সরকারি নিয়ম কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর এত বড় ক্ষমতা হয় কী করে? দ্বিতীয়ত, সেতুটি বেআইনি ভাবে উদ্বোধনের ৫ দিন পরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এত বড় বিপজ্জনক ও বেআইনি কাজ ঘটে যাওয়ার পর ৫ দিন ধরে পৌর কর্তৃপক্ষ ও সরকার কী করছিল? তারা কেন ওরেভা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিল না?

*গুজরাটের ভদোদরাতে নাগরিকদের শোকজ্ঞাপন। ৩১ অক্টোবর*

এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বিজেপির নেতা-কর্মী ও তাদের আশীর্বাদপুষ্ট মিডিয়া আবার ঠারে ঠোরে বলছে, এর জন্য দায়ী সাধারণ মানুষই! কারণ, সেতুর বহন ক্ষমতা ১২৫ জন হলেও দুর্ঘটনার সময় তাতে প্রায় ৫০০ জন উঠেছিলেন এবং কিছু লোক ক্রমাগত ঝুলন্ত সেতুটি ঝাঁকানোর চেষ্টা করায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেতু। এর সমর্থনে কিছু ভিডিয়োও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। পরে অবশ্য দেখা গেছে ওই ভিডিয়োগুলি পুরনো। তা ছাড়া, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ওভারলোডের কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে, তা হলে তা দেখভালের দায়িত্ব কার ছিল? কেন ওই সেতুতে বাড়তি পর্যটককে উঠতে দেওয়া হল? বেসরকারি ঠিকাদারের উপর দায় চাপিয়ে সরকার হাত ধুয়ে ফেলতে পারে না। খবরে প্রকাশ, সেতু মেরামতের চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে হাজির ছিলেন মোরবীর জেলাশাসক জিটি পাণ্ড্য। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে, কোম্পানি টিকিটের হার বাড়াতে পারবে, সেতুটি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে পারবে এবং সরকারি সংস্থার কোনও হস্তক্ষেপ থাকবে না। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কার, সে বিষয়টি ওই চুক্তিতে উল্লেখ নেই। জনসাধারণের জীবনের দামটা সরকারের কাছে সস্তা!

**আসল দোষীদের আড়ালের চেষ্টা**

গুজরাটের সরকারের পুলিশ যে এফআইআর করেছে, তাতে 'ওরেভা' সংস্থার নামই নেই। নাম নেই সেতুর তদারকির দায়িত্বে থাকা মোরবী পুরসভার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও। স্থানীয় ওরেভা'র দু'জন ম্যানেজার, দু'জন শ্রমিক, তিনজন নিরাপত্তাকর্মী এবং দু'জন টিকিট বিক্রেতাকে গ্রেফতার করে তাদেরই মূল অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা বিজেপি সরকার দুর্নীতি ও কাটমানি চক্রকে যে আড়াল করছে তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

২০২০ সালে 'ওরেভা' সংস্থার কর্ণধার জয়সুখভাই পটেলকে 'নব নক্ষত্র' সম্মান দেন আমেদাবাদ পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কিরীট সোলাঙ্কি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও জয়সুখের সুসম্পর্ক। কচ্ছের রণ অঞ্চলে একটি জল প্রকল্প নিয়ে গত বছর অক্টোবরে শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন জয়সুখভাই। শাসকদলের শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই কি সেতু বিপর্যয়ের এফআইআরে 'ওরেভা' সংস্থার উল্লেখ নেই?

বাস্তবে বিজেপি পরিচালিত মোরবীর পৌরবোর্ডের কর্তা, সরকারি কর্তা ও শাসক দলের নেতাদের সাথে ওরেভা গোষ্ঠীর মালিকের অশুভ আঁতাতের পরিণাম হল এই মর্মান্তিক মৃত্যুযজ্ঞ। গুজরাট নাকি ভাইব্র্যান্ট! মানে উন্নয়ন এখনে চকচক করছে। সে উন্নয়নের চেহারা কী? ব্রিজ উদ্বোধনের পাঁচ দিনের মাথায় তার কঙ্কাল চেহারা বেরিয়ে পড়ল। আর এই যে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ''না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা''—তার প্রহসনও এই ঘটনায় আবারও দেখা গেল।

উন্নয়ন ভেঙে পড়ার এমন ঘটনা পরপর ঘটছে। এই বছরেই এপ্রিল মাসে ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে রোপওয়ে দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছিল তিনটি প্রাণ। প্রায় দু'দিন মাঝ আকাশে ঝুলে ছিলেন বহু পর্যটক। তাঁদের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, সারা দেশের মানুষের শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। সেখানেও সামনে এসেছে রোপওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থার চূড়ান্ত গাফিলতি এবং তাদের সাথে সরকারি কর্তাদের আঁতাতের ফলে সমস্ত নিয়মকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার কথা।

গত অক্টোবর মাসে কেদারনাথে মর্মান্তিক হেলিকপ্টার বিপর্যয়ে পাইলট সহ সাতজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু ঘটল। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথে ভক্ত সমাগম বাড়াতে বেসরকারি হেলিকপ্টার সংস্থাগুলি এই লোভনীয় ব্যবসায় নেমে কোনও নিয়মের তোয়াক্কা করে না। স্থানীয়দের অভিজ্ঞতা হল তারা হেলিকপ্টার পরিষেবাকে প্রায় অটোরিক্সার পরিষেবায় নামিয়ে এনেছে। সরকারি কর্তা ও উত্তরাখণ্ডের বিজেপি নেতাদের সৌজন্যে বেসরকারি সংস্থাগুলি অতি মুনাফার লালসায় ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রপাতের মধ্যেও ডজন ডজন হেলিকপ্টার উড়িয়ে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করলেও বিমান চলাচলের নিরাপত্তায় যথাযথ গুরুত্ব নেই। শাসক দলের নেতা ও সরকারি কর্তাদের টেবিলে পৌঁছে দেওয়া নজরানাই সব নিয়মভাঙার ছাড়পত্র। সব পরিষেবার বেসরকারিকরণের জয়গান না করে জলগ্রহণ করেন না যারা মোরবীর মৃত্যু মিছিল তাদের দেখিয়ে দিল, বেসরকারিকরণ মানেই উন্নত পরিষেবা নয়। অন্ধ মোদি সরকার সবকিছু বেসরকারি করে দেওয়ার যে তোড়জোর চালাচ্ছে তার পরিণাম কী হতে পারে মোরবী তা দেখিয়ে গেল।

## জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দলের পূর্বতন মধ্য কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড তপেন নাগচৌধুরী দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৯ অক্টোবর কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

কমরেড তপেন নাগচৌধুরী ১৯৬৬ সাল নাগাদ দলের সঙ্গে যুক্ত হন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় প্রবল দারিদ্রের মধ্যে পরিবারের সকলকে দেখার দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। এর মধ্যেও তিনি দলের কাজে যথাসম্ভব সময় দিতেন। এক্ষেত্রে মধ্য কলকাতার তৎকালীন কমরেডদের পারস্পরিক অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সম্পর্ক তাঁকে সাহায্য করেছে। সেই সময় চারণিক নাট্যগোষ্ঠী ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তিনি অংশ নেন। পরবর্তীকালে তিনি ইন্সস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স সংস্থায় চাকরিতে যোগ দেন। ওই সংস্থায় কর্মচারীদের কোনও ইউনিয়ন ছিল না। ম্যানেজমেন্টের মর্জির ওপরই কর্মচারীদের নির্ভর করতে হত। কমরেড তপেন নাগচৌধুরী ওই সংস্থায় ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য গোপনে কর্মচারীদের সংগঠিত করতে থাকেন। এ আই ইউ টি ইউ সি নেতৃত্বের সহায়তায় সেখানে ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে দলের সাথে যুক্ত করেন। তাঁর এক সহকর্মীকে নিয়ে তিনি খিদিরপুর এলাকায় ভাড়াটিয়া সংগঠন গড়ে তোলেন। সেই সহকর্মী দলের সমর্থকে পরিণত হন। কমরেড নাগচৌধুরী দীর্ঘকাল ছিলেন ইন্সস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

মধ্য কলকাতায় বহু পরিবারের সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন। একসময় পৌরসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী হিসেবে তিনি ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরিবারের সকলকে দলের সমর্থকে এবং এক ভাইকে দলের কর্মীতে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কমরেড তপেন নাগচৌধুরী ছিলেন দলের জুনিয়র কমরেডদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। আর্থিক প্রশ্নে তিনি দলের পরামর্শ নিয়ে চলার চেষ্টা করতেন। শেষ দিকে বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকায় দলের কাজ করতে পারতেন না, কিন্তু সমস্ত খোঁজখবর রাখতেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রবি বসু সহ অন্যান্যরা হাসপাতালে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। কমরেড তপেন নাগচৌধুরীরর মৃত্যুতে দল পুরনো দিনের একজন মননশীল কর্মীকে হারাল।

**কমরেড তপেন নাগচৌধুরী লাল সেলাম**

# সমাজতন্ত্র যা দিতে পারে পুঁজিবাদ তা পারে না

(গত সংখ্যার পর)

**পতিতাবৃত্তি নির্মূল করেছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র**

দেশ থেকে পতিতাবৃত্তি নির্মূল করার জন্য ১৯২৩ সাল নাগাদ সোভিয়েত রাষ্ট্র বিশেষ ভূমিকা নেয়। কেন নারীরা এ পথে যায় তা বুঝতে প্রথমে একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করে হাজার হাজার নারীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তার, মনোবিদ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের তৈরি এই প্রশ্নপত্র শোরগোল ফেলে দেয়। নারীরা কেন পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে? এর উত্তরে দুটি বিষয়ে জানা যায়— প্রথমত, দারিদ্রের চাপে, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে মেয়েরা এই জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, কারও না কারও প্ররোচনায় তারা এ পথে পা বাড়ায়। এই প্ররোচনাকারীরা কারা? তারা হল পতিতালয়ের পরিচালক, যারা নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা করে বিপুল মুনাফা অর্জন করে।

পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিরামহীন সংগ্রাম শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক করে একে নিছক প্রচারের মধ্য দিয়ে দূর করা যাবে না। পতিতাবৃত্তিকে নির্মূল করতে হলে দরিদ্র মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে এবং ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ১৯২৫ সালে দু'দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়— প্রথমে অভাবগ্রস্ত নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবস্থা করা হয় তাদের বাসস্থানের। বিশেষত সেই সব মেয়েদের যাদের স্থায়ী বাসস্থান নেই। সাথে সাথে কেন্দ্রীয় ডিক্রি জারি করা হয়। পতিতাদের বিরুদ্ধে জার আমলের দমনমূলক আইন সংশোধন করে পতিতাবৃত্তি দ্বারা মুনাফাকারীদের নির্মূল করার জন্য কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে এক ধাক্কায় প্রচুর সংখ্যক পতিতা-ব্যবসায়ীর জায়গা হয় জেলখানায়। আঘাত নেমে আসে খদ্দেরদের উপরেও। খদ্দেরদের নিরস্ত করার ব্যবস্থাও করা হয়। ঘোষণা করা হল, পতিতাদের খোঁজে অভিযান চালানোর সময় কোনও পুরুষ ধরা পড়লে তার নাম-ধাম-পরিচয় জানিয়ে বড় অক্ষরে লিখে দেওয়া হবে 'নারী দেহের ক্রেতা'। এই ঘোষণা একটা নিয়ন্ত্রণ হিসাবে কাজ করে।

পাশাপাশি শুরু হয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ইজভেস্তিয়া পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উত্থাপিত হয় একটি নৈতিক প্রশ্ন— 'যদি নারীকে শোষণ করে বাঁচা জঘন্যতম অপরাধ হয় তা হলে নারীর সম্মান ক্রয়ও কি সমান অপরাধ নয়'? সোভিয়েত পুরুষদের অবশ্যম্ভাবী এক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন তোলা হয়— সোভিয়েত নারী ও পুরুষের আইনি, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার সমান। প্রেমের স্বীকৃতির সমস্ত বাধা অপসারিত। তাই সেখানে 'যৌনতা ক্রয়' বিবেকবর্জিত অসহ্য কাজ। নারীকে অধঃপতিত করাই শুধু নয়, নিজের শালীনতার সীমাও এর দ্বারা লঙ্ঘন করা হয়। যে ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্য নারীকে শোষণ করে, সে কি নিজেকে সমাজের নাগরিক হিসাবে দাবি করতে পারে? এইসব বিষয় মানুষকে ভাবাল। অপরদিকে থিয়েটার, নাটক, গল্প, কবিতার মাধ্যমে জনগণকে সোভিয়েত রাশিয়া অতি দ্রুত সমাজজীবন থেকে গণিকাবৃত্তি উচ্ছেদ করতে সক্ষম হল।

**সমাজতন্ত্র পণপ্রথার অবসান ঘটিয়েছিল**

পণপ্রথা নারীজীবনের এক মারাত্মক অভিশাপ। এর পিছনে রয়েছে সম্পত্তি বৃদ্ধির পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত পুরুষ পণের জন্য স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করে। বহুক্ষেত্রে মেয়েরাও এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ভারতের মতো বুর্জোয়া দেশে পণপ্রথা বিরোধী আইন থাকলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয় না। সমজতন্ত্র এই মানসিকতার উৎসটাকেই উপড়ে ফেলে দিয়েছিল সম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানারা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

এক মাসের মধ্যে যে সোভিয়েত বিবাহ আইন জারি করা হয়, তাতে পণপ্রথার উপর কুঠারাঘাত করা হয়। ঘোষণা করা হয়, সোভিয়েত পরিবারের ভিত্তি হবে পারস্পরিক প্রেম ও সমানাধিকার।

এঙ্গেলস বলেছেন, ''বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তখনই পাওয়া যেতে পারে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা বিলোপ হবে এবং তা থেকে উদ্ভূত সম্পত্তি-সম্পর্ক দূর হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে যে গৌণ অর্থনৈতিক কারণগুলি এখন পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাও দূর হয়ে যাবে। .....যখন পুরুষের পক্ষে আর অর্থ দিয়ে অথবা অন্য উপায়ে কোনও সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে নারীকে ক্রয় করা যাবে না। আর নারীর পক্ষেও প্রকৃত ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনও কারণেই পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে না, অথবা আর্থিক পরিণামের ভয় তাদের প্রিয়জনকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা হবে না, তখন বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই বিবেচ্য হবে না''।

**সমাজতন্ত্র ক্লান্তিকর একঘেয়ে কাজ থেকে নারীকে মুক্ত করেছিল**

রান্নাঘরে নারীদের বন্দিদশা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, "বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা। রাঁধার পর খাওয়া। আর খাওয়ার পর রাঁধা।" এই ক্লান্তিকর একঘেয়ে জীবন থেকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নারীকে মুক্ত করেছিল। হাজার হাজার গণ-রান্নাঘর তৈরি করে লক্ষ লক্ষ মহিলাকে রান্নাঘরের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে সমাজতন্ত্র। নারীকে যাতে রান্নায় ব্যস্ত থাকতে না হয়, তার জন্য ১০/১৫টি পরিবার নিয়ে কো-অপারেটিভ কিচেন, কো-অপারেটিভ ডাইনিং হল, কো-অপারেটিভ লন্ড্রি, এসব ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে কোনও পরিবারে কেউ আটকে না থাকে। শ্রমজীবী নারীদের সুবিধার্থে কারখানার কাছাকাছি নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেনের ব্যবস্থা থাকত, যাতে মহিলারা সন্তানদের দুধ খাওয়াতে পারেন, যত্ন নিতে পারেন। যৌথ কৃষি ব্যবস্থাও নারীকে মুক্ত করেছিল। নভেম্বর বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় মেয়েরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খেটেও জানতে পারত না, তাদের রোজগার কতটুকু। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রত্যেক নারী বুঝতে পারল, পরিবারের জন্য তার উপার্জন কতটা। সন্তানসম্ভবা মহিলাদের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি, সন্তান জন্মের ১২ সপ্তাহ আগে থেকে ১২ সপ্তাহ পর পর্যন্ত। তারপর ১ বছর সবেতন ছুটি। তারপর কাজে গেলে ক্রেশে সন্তানকে রেখে দিত। সেই সন্তানকে খাওয়ানোর, পোশাক দেওয়ার দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। কারণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শিশুকে সামাজিক সম্পদ মনে করে।

এই প্রতিবেদন তৈরির সময় গত ৪ নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'নয়া দাসত্ব' সম্পাদকীয়টি ভারতে নারীদের দুঃসহ চিত্র দেখিয়ে গেল। রাজস্থানে কিশোরী ও তরুণী মেয়েদের নিলামে তুলে ঋণ শোধ করছে পরিবারের পুরুষরা। নিলামে বিক্রি হওয়া এই মেয়েদের পাচার করা হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে। তাদের স্থান হচ্ছে পতিতালয়ে। এর কারণ তো শুধু পুরুষতন্ত্র নয়, পুঁজিবাদী শোষণতন্ত্র। সম্পাদকীয়টি এই মর্মান্তিক খবর সামনে আনলেও এর মূলোচ্ছেদের কোনও পথ দেখাতে পারেনি। এর জন্য যে সমাজতন্ত্র প্রয়োজন, তা বুর্জোয়ারা প্রচার করতে পারে না। এটা বুঝতে হবে, সমস্যাদীর্ণ মানুষকেই। হয় সমাজতন্ত্র, নয় মৃত্যু, অমর্যাদার জীবন— এটা শুধু একটা কথার কথা নয়। অত্যন্ত বাস্তব।

**উন্নততর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল সমাজতন্ত্র**

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র মনে করত, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রয়োগ ছাড়া মানুষ পূর্ণ হতে পারে না। তাই মানুষের ভাবজগতকে অধ্যাত্মবাদী চিন্তা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা দরকার। তার মননজগত, রুচিবোধ ব্যক্তিবাদী স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত করে সমাজতন্ত্রের উপযোগী যৌথ সংস্কৃতির ভিত্তিতে উন্নীত করা দরকার। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ে তোলার জন্য শিল্প সংস্কৃতি, সঙ্গীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র— এককথায় মানব-মনের সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনা দরকার। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র তা শুরু করেছিল।

১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখক সংঘ ঘোষণা করেছিল, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাই হবে শিল্পীদের শিল্প সৃষ্টির মূল পদ্ধতি— যার উদ্দেশ্য হবে, লেনিনের ভাষায়, "সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মানুষ তৈরি করা"। এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কী? স্ট্যালিন বলেছিলেন, "শিল্পীদের কাজ হল, জীবন যেমন তাকে তেমন দেখানো। আর যদি সে জীবনকে সত্য রূপে দেখতে পারে, তবে সে দেখবে জীবন সমাজতন্ত্রের দিকেই এগিয়ে চলেছে। এই হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। .... সাহিত্যিকরা হবেন মানবাত্মার রূপকার"।

সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি কি ছাঁচে ঢালা? একদমই না। স্ট্যালিন ছিলেন, এর ঘোরতর বিরোধী। তিনি বলতেন, 'ধৈর্য ধর, আলোচনা কর, তর্ক-বিতর্ক কর, যারা ভ্রান্ত পথের পথিক তাদের বিভ্রান্তি দূর কর, তোমাদের সৃষ্টিশীল কাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কর। কিন্তু কোনও মতেই কারও কণ্ঠরোধ করা চলবে না।" তিনি আরও বলেছেন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমস্ত ধারার মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পক্ষেই আমরা দাঁড়াব। কোনও একটা গোষ্ঠী বা সংগঠন সাহিত্য বা প্রকশনার জগতে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করবে এ আমরা মেনে নিতে পারব না। ... এর অর্থ হবে সর্বহারা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা।

১৯৩২ সালে গোর্কির বাড়িতে সোভিয়েত লেখকদের সাথে আলোচনায় স্ট্যালিন বলেছিলেন, কবিতা ভাল, উপন্যাস আরও ভাল, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের দরকার নাটক। সোভিয়েত নেতারা মনে করতেন দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করার পর সবাই গল্প-উপন্যাস পড়ে উঠতে পারে না। তাদের জন্য প্রয়োজন নাটক। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কাছে যে চিন্তা নিয়ে যেতে হবে, নাটকই তা ভাল করতে পারবে। স্ট্যালিন চাইতেন চলচ্চিত্র এমন হোক যা দেখে মানুষ আনন্দ পাবে, যা মতাদর্শগত দিক থেকে জনগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। ফিল্ম, রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে

*চারের পাতায় দেখুন*

# সমাজতন্ত্র যা দিতে পারে

*তিনের পাতার পর*

জনগণের চেতনার মানের বিকাশ ঘটাবে।

স্ট্যালিন বলতেন, 'দর্শকরা আনন্দ চায়, চায় তেজোদীপ্ত মন। ফিল্মে সে নিজের আশা-আকাঙ্খা-আনন্দ-বেদনার প্রকাশ দেখতে চায়। কিন্তু জনপ্রিয় ফিল্ম তৈরি করাই যথেষ্ট নয়, তাকে প্রয়োজনীয়ও হতে হবে, সমসাময়িক বিষয় নিয়েও তাকে কাজ করতে হবে। আর তা করতে হবে এমনভাবে যাতে তা নিষ্প্রাণ, গুরুগম্ভীর, নিরানন্দময় না হয়।"

শিল্প-সাহিত্য কি সমাজতান্ত্রিক সরকারের অন্ধ অনুগত হবে? একদমই নয়। স্ট্যালিন বলতেন, সেভিয়েত চলচ্চিত্রের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের সীমাবদ্ধতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তিনি বলতেন, সিনেমা যদি এই কাজ করতে না পারে, তবে মনে হবে সব কিছুই আগে থেকে ঠিক করা, সাজানো-গোছানো। তা হলে দর্শকের মনে আবেগ তৈরি হবে না।

রাশিয়ার ফিল্মে এই সমালোচনামূলক প্রক্রিয়া ছিল। ট্রাই গোভারিক ফিল্মে একটা নির্মাণ ক্ষেত্রের তিনজন নেতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে একজন নেতার দুর্নীতি কীভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষতি করছে তা দেখানো হয়েছিল। স্ট্যালিন একে সমর্থন করে বললেন, এটা দেখানো দরকার ছিল।

ক্লারা জেটকিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, লেনিন বলতেন শিল্প সম্পর্কে আমরা কী ভাবি তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিল্প সম্পর্কে কোটি কোটি জনগণ কী ভাবে তা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিল্প সম্পূর্ণতা লাভ করে যখন তা কোটি কোটি জনগণের হৃদয়ে প্রোথিত হয়।

সিডনি ওয়েব ও বিয়াত্রিস ওয়েব লিখেছেন, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা মনে করে বৈষয়িক লাভ মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হতে পারে না। ....মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য হল, মানবজাতির সর্বজনীন কল্যাণ। ....সোভিয়েত সমাজতন্ত্র মনে করে সেই জীবন সুন্দর যা সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনে কল্যাণকর। এই জীবনবোধেরই বাস্তব প্রতিফলন হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। তাই সে বিকাশের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে পেরেছিল।"

মানব ইতিহাসে যত সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, সমস্ত দিক থেকে সমাজতন্ত্র তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এর শত্রুরও অভাব নেই। কারা সমাজতন্ত্রের শত্রু? যারা পরের শ্রমের উপর নির্ভর করে পরগাছার মতো জীবনযাপন করতে চায়, যারা শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি, তারা এর বিরুদ্ধে। পুঁজিপতিদের প্রসাদে পুষ্ট যারা, সমাজতন্ত্র কায়েমে যাদের বিলাসবহুল, আমিরি জীবনে ঘা পড়েছে, তারা এর বিরুদ্ধে। তারা দিন রাত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মিথ্যার উপর মিথ্যা সাজিয়ে নিরন্তর কুৎসা করে বেড়াচ্ছে। সমাজতন্ত্র যে দর্শনকে ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হয়, সেই মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে এদের অপপ্রচার নিরন্তর। এর দ্বারা সাময়িক ভাবে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে, তাতে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি কিছুটা শ্লথ করতে পারে, কিন্তু শোষিত-নিষ্পেষিত মানুষের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা এতটুকু গুরুত্ব হারায় না।

জীবনে বড় না হলে বড় জিনিসকে চেনা যায় না। যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান তারা সমাজতন্ত্রের কদর বোঝেন। আন্তর্জাতিক চিকিৎসক ডাঃ নর্মান বেথুন এক আবেদনে বলেছেন, "আসুন আমরা কমিউনিস্ট বিরোধিতার জঘন্য প্রতারণা পরিত্যাগ করি। এতে হিটলার, মুসোলিনির স্বার্থ সাধিত হয়, কিন্তু দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয় না।" সাহিত্যিক প্রেমচন্দ লিখেছেন, ভারতের মতো দেশ যেখানে জনসংখ্যার বড় অংশ গরিব, সেখানে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সব ধরনের শ্রমিক রয়েছে সেখানে সমাজতন্ত্র ছাড়া তাদের আদর্শ আর কী হতে পারে?" বার্নাড শ লিখেছেন, "আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা (৩০ জন) সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলাম। আমরা কেউ কেউ সভ্য এই দেশের অধিকাংশ জায়গায় ঘুরেছি। আমরা বলতে চাই, কোথাও আমরা অর্থনৈতিক দাসত্ব, অনাহার, বেকারি ও আয়েশে থাকার জন্য উন্মাদের মতো প্রচেষ্টা লক্ষ করিনি। সর্বত্র আমরা দেখেছি, আশায় ভরপুর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জনগণ। অত্যাচারী শাসকদের অযোগ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে তারা গড়ে তুলছে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, বিকাশ ঘটাচ্ছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার, শিক্ষার বিস্তার করেছে, নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে এসেছে, শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। এসব তারা করেছে পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করে।... শ্রমের এবং আচরণের এমন একটা দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছে যা অনুসরণ করার জন্য যদি আমরা আমাদের শ্রমজীবী মানুষদের উদ্বুদ্ধ করতে পারি তবে তারা খুবই উপকৃত হবেন।" (শেষ)

# মেডিকেল কাউন্সিল নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতি

পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়কে ছাপিয়ে সামনে এল ব্যাপক জালিয়াতি, সন্ত্রাস, কারচুপি ও অর্ধেকের বেশি নকল ব্যালটে ছাপ্পা ভোটের রমরমা।

এই নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতি, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং ৫০ শতাংশের উপর জাল ব্যালটে ছাপ্পা ভোট পড়েছে, যা দেশের সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে পদদলিত করেছে। এই নির্বাচন চিকিৎসক সমাজের মান মর্যাদা এবং ভাবমূর্তিকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। হাইকোর্টের নির্দেশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও, শাসক দলের চাপে, নির্বাচন আধিকারিকরা এই নির্বাচনে তার কোনও নিয়মই মানেননি। ফলে নির্বাচন ঘোষণার প্রথম দিন থেকেই শাসক দলের চিকিৎসকেরা অন্যান্য চিকিৎসকদের উপর ব্যাপক ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে এবং নানাবিধ অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। যেমন,

১) নির্বাচন আধিকারিক শাসক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নমিনেশন জমা দেওয়ার জন্য মাত্র চার দিন সময় দিয়েছিলেন যার মধ্যে শনিবার ও রবিবার ছিল ছুটির দিন। নির্বাচনটা রাজ্যভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হল না।

২) নির্বাচন আধিকারিক পোস্ট অফিস থেকে ফেরত আসা ব্যালটের কোনও হিসাবই রাখেননি। কোনও রিসিভিং রেজিস্টারও ছিল না। হিসাব বহির্ভূত ফেরত আসা ব্যালটকে কাজে লাগিয়ে শাসকদল ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দিয়েছে।

৩) ভোট গণনার সময় ব্যাপক সংখ্যক জাল ব্যালট পাওয়া যায়। 'এইচ' প্যানেলের ক্ষেত্রে মূলত দু'ধরনের জাল ব্যালট পাওয়া গেছে। এক ধরনের জাল ব্যালটে প্রার্থী তালিকা থেকে মূল ব্যালটের ১১ নম্বরের নামটি বাদ গেছে এবং এক নম্বরের নামটি দুবার ছাপা হয়েছে। চাপে পড়ে নির্বাচন আধিকারিক জানাতে বাধ্য হন এই ব্যালট কাউন্সিল অফিস থেকে ছাপানো হয়নি। তা হলে কোথায় ছাপানো হল? কারা ছাপাল? কারাই বা ভোটের কাজে লাগাল? কাউন্টিং করার সময় দেখা গেল এই জাল ব্যালটগুলিতে শাসকদলের প্রার্থীরাই প্যানেল ভোট পেয়েছে। তা হলে কারা এ কাজ করেছে?

এর পাশাপাশি আর এক রকমের জাল ব্যালটও ব্যাপক সংখ্যায় পাওয়া গেছে যেটা মূলত কালার জেরক্স। দেখা গেছে এই নকল ব্যালটগুলিতে যে ভোট পড়েছে তার সবগুলোই সরকার বিরোধী বলে প্রচারিত জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টরস-এর প্রার্থীদের প্যানেল ভোট।

সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাক্তাররা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে কিছু জাল ব্যালট বাতিল হয়। যত জাল ব্যালট বাতিল করা গেছে সেই সংখ্যাটা সামগ্রিক ভোটের অর্ধেকেরও বেশি। বলাই বাহুল্য কাউন্টিং হলে সারাক্ষণ ঝামেলা চিৎকার চেঁচামেচি চলতে থাকায় অসংখ্য জাল ব্যালট ধরা সম্ভব হয়নি।

৪) ভোট গণনা শুরুর পর থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে গণনা হওয়ার পরিবর্তে প্রতিদিন মাত্র কিছু সময়ের জন্য ভোট গণনার কাজ চলেছে। যার ফলে কাউন্টিং প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি হয়েছে এবং এইভাবে শাসক দলকে পুনরায় জালিয়াতি এবং দুর্নীতির নতুন নতুন সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

৫) ভোটপর্বে শাসক দল চিকিৎসকদের বদলির ভয় দেখিয়ে এবং প্রোমোশন সহ অন্যান্য প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়ে বিপুল সংখ্যক ব্যালট সংগ্রহ করেছে। গণনা চলাকালীন ক্রমাগত বিরোধীদের উপর চড়াও হওয়া,. ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। নির্বাচন আধিকারিক ও কর্মীদের শাসক দলের হয়ে কাজ করানো এবং নির্বাচন আধিকারিকের শাসক দলের হয়ে নির্লজ্জ দালালি এসবই চলেছে।

৬) এই সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদে গণনা চলতে চলতেই চতুর্থ দিনে এই নির্বাচন বয়কট করে এবং ওয়াক আউট করে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও এসডিএফ।

৭) এই দুটি সংগঠনের দাবি, সকল জাল ব্যালট ফরেন্সিক ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে। পাশাপাশি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে এই সকল জাল ব্যালটের উৎস এবং সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তাদের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দেওয়া হয় এবং বিচার চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করা হয়।

এই নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছে স্বৈরাচার। পদদলিত হয়েছে গণতন্ত্র। ভূলুণ্ঠিত হয়েছে চিকিৎসক সমাজ তথা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজের মান মর্যাদা। এই নির্বাচনে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, যারা চুরি বিদ্যার আশ্রয় নিয়েছে, বিরোধী শিবিরের চিকিৎসকদের উপর ছোট বড় নানা কারণে চড়াও হয়েছে তাদের সাথে কোনও ভাড়া করা গুণ্ডার পার্থক্য নেই। অথচ তারা এই সমাজের উঁচুতলার এবং উচ্চশিক্ষিত বলে মানুষের সমাদর পাওয়া চিকিৎসক সমাজেরই একটা অংশ। এ লজ্জা ঢাকা পড়বে কীসের আড়ালে?

## ব্রিজের দাবিতে কনভেনশন

৩০ অক্টোবর হুগলি জেলার খানাকুলে বন্দর এলাকায় রূপনারায়ণ নদীর উপর একটি কংক্রিট ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে ধান্যঘোরী উচ্চ বিদ্যালয়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। হুগলির খানাকুল-২ ব্লক ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ব্লককে বন্দর এলাকায় বিচ্ছিন্ন রেখেছে রূপনারায়ণ নদ। এই ব্রিজ নির্মাণ হলে কয়েক লক্ষ মানুষের চিকিৎসা সহ যাতায়াতের সুবিধা হবে। কনভেনশনে দাবি ওঠে, বন্দর এলাকায় রূপনারায়ণ নদীর উপর কংক্রিটের ব্রিজ অবিলম্বে নির্মাণ করতে হবে ও যতদিন ব্রিজ নির্মাণ না হচ্ছে ততদিন সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে নৌকায় নিরাপদে নদী পারাপারের ব্যবস্থা করতে হবে। সভাপতিত্ব করেন বলাই চন্দ্র পাড়ুই।

বক্তব্য রাখেন ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি, ঘাটাল-রানিচক নদীবাঁধ রক্ষা কমিটির সহসভাপতি মদন চন্দ্র রাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কনভেনশন থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্রিজ নির্মাণ কমিটি গঠিত হয়।

## সরকারি কর্মীদের অবস্থান

ডিএ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। এর তীব্র নিন্দা করেছে ২৫টি সংগঠনের মোর্চা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। মঞ্চের শরিক পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস জানান, রাজ্যের ডি এ প্রাপকেরা এর বিরুদ্ধে ১১ নভেম্বর সারা দিন অবস্থান ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করবে।

# সিপিডিআরএস-এর শিবির তমলুকে

বর্তমানে দেশের সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার সংবিধানে যতটুকু উল্লেখিত রয়েছে প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন তা নানা ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। ন্যায় বিচারের ধারণা এখন রাষ্ট্র সহ বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট। মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম পরিবেশ নেই। স্বাধীনতা নেই। যেটুকু সাংবিধানিক বিধির ব্যবস্থা আছে, তাও বেশিরভাগ মানুষের অজানা।

সেন্টার ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজম (সিপিডিআরএস)-এর উদ্যোগে বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে এক সেমিনার সংগঠিত হয় ২৯ অক্টোবর তমলুকের রত্নালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন আবহবিদ অশোক কুমার হাজরা, জেলা সংগঠক প্রদীপ দাস, নাট্যকর্মী সূর্য চক্রবর্তী, শিক্ষক তপন জানা, তরুণ সাউ প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষ থেকে ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে জেলা জুড়ে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

# ভগবানপুরে ব্যাঙ্ক প্রতারণার বিরুদ্ধে ঋণগ্রহীতাদের বিক্ষোভ, দাবি আদায়

ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের প্রতারণা, কৃষিঋণ গ্রাহকদের উপর অন্যায় জুলুম ও গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে অবৈধভাবে টাকা কেটে নেওয়ার প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর-১ ব্লকে প্রতিবাদী মঞ্চের আহ্বানে ৪ নভেম্বর দু' শতাধিক কৃষি ঋণগ্রহীতা বিক্ষোভ দেখান।

২০০৮ সালে বন্যার পর কৃষকদের পঞ্চাশ হাজার টাকা কিসান ক্রেডিট কার্ড মারফত লোন প্রদানের কথা ঘোষণা করে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখা আড়াই হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা লোন দিয়ে বাকিটা ফিক্সড ডিপোজিটে রাখার আশ্বাস দেয়। ৯ বছর পর ২০১৭ সালে নূতন ম্যানেজার এসে ওই কৃষকদের সুদে আসলে টাকা ফেরত দেওয়ার ফরমান জারি করেন। ওই সময় ঋণী কৃষকরা আন্দোলন গড়ে তুললে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তাদের ত্রুটির কথা স্বীকার করে অবৈধ ঋণ মকুব করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ফের নতুন ম্যানেজার এসে আবার গ্রামে গ্রামে ফড়ে-এজেন্ট পাঠিয়ে গ্রাহকদের ভয় দেখিয়ে ওই টাকা সুদে-আসলে দিতে বাধ্য করছে। এরই বিরুদ্ধে গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখান।

আন্দোলনের চাপে ব্যাঙ্কের উচ্চ আধিকারিকেরা এসে মঞ্চের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে ঋণগ্রহীতাদের 'নো ডিউজ' সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। ব্যাঙ্কের অন্য কোনও অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটা হবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দেন।

কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন মঞ্চের সভাপতি বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী, সম্পাদক আজিজুর রহমান, অজিত ভুঁইয়া, রণজিৎ গিরি প্রমুখ। আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের রাজ্য সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস, কিসান - খেতমজদুর সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক জগদীশ সাউ, শচীন মান্না প্রমুখ।

সারা দেশে দলের আন্দোলনের খবর পেতে

এস ইউ সি আই (সি)-র অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ফলো করুন

# আন্দামানে মদ বন্ধের দাবি নাগরিকদের

আন্দামান ও নিকোবরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা 'এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন'-এর পক্ষ থেকে ১৭ অক্টোবর পোর্ট ব্লেয়ারে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়ে এলাকায় মদ-গাঁজা ও জুয়ার প্রসার বন্ধের দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ মানুষ যখন সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে, সেই সময়ে রামকৃষ্ণপুর, নেতাজিনগর, রবীন্দ্রনগর, বিবেকানন্দপুর ইত্যাদি গ্রামগুলিতে নতুন বিপত্তি হিসাবে মদ ও গাঁজার ব্যাপক প্রসার ঘটছে। নেশার প্রকোপে পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আত্মহত্যা ও পথ-দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। মারাত্মক নানা রোগেরও শিকার হচ্ছে মানুষ।

এই পরিস্থিতিতে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রামগুলিকে মদ, গাঁজা ও জুয়ামুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। নাগরিকরা জানান, মদ-গাঁজা নয়, তাঁদের প্রয়োজন স্কুলগুলির জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষক, হাসপাতালে আলট্রাসাউন্ড মেশিন চালানোয় দক্ষ স্থায়ী কর্মী, খেলার মাঠ, অব্যাহত বিদ্যুৎ পরিষেবা, পরিস্রুত পানীয় জল, রাস্তাঘাট, সুষ্ঠু টেলি যোগাযোগ, রামকৃষ্ণপুরে গ্রামীণ হাসপাতাল ইত্যাদি।

# কাজের দাবিতে দরং জেলা যুব সম্মেলন

সকল বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত হারে বেকার ভাতা, দরং জেলায় রেললাইন স্থাপন করে রেল পরিষেবা চালু সহ বিভিন্ন দাবিতে আসামে এ আই ডি ওয়াই ও-র দরং জেলা সম্মেলন ৩০ অক্টোবর মঙ্গলদৈ শহরের সাহিত্যসভা ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কমরেডস ফুলেন নাথ ও হাতিম আলি এবং কমরেড জিতেন কলিতাকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) দরং জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড নুরুল ইসলাম। বক্তা ছিলেন এ আই ডি ওয়াই ও-র আসাম রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি কমরেড জিতেন চলিহা।

তিনি যুব সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে সেগুলি সমাধানের লক্ষ্যে উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিরিঞ্চি পেগু।

কমরেড ফুলেন নাথকে সভাপতি, কমরেড মুন কুমার ডেকাকে সম্পাদক করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট দরং জেলা কমিটি গঠিত হয়।

# কাঁথিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ডেপুটেশন

বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার কাঁথি মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ২ নভেম্বর বিদ্যুৎ দপ্তরের কাঁথি ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২০১৩-১৪ সালের কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল হিসাবে নেওয়া টাকা ফেরত, বিকল ট্রান্সফরমারগুলি অবিলম্বে পরিবর্তন, স্মার্ট প্রিপেড মিটার চালু না করা, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ (সংশোধনী বিল-২০২২) বাতিল প্রভৃতি দাবিতে ছিল এ দিনের কর্মসূচি। ডিভিশনাল ম্যানেজার দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে অতি সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আশ্বাস দেন।

নেতৃত্ব দেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোকতরু প্রধান, জেলা কমিটির অফিস সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক, কাঁথি মহকুমা শাখার পক্ষে পঞ্চানন দাস প্রমুখ।

# সারা দেশে ১ লক্ষ ছাত্রকমিটি গঠনের সঙ্কল্প এআইডিএসও-র

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর যে সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনছে দেশের বিজেপি সরকার তাকে প্রতিরোধ করতে সারা দেশে ১ লক্ষ ছাত্র কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইডিএসও সর্বভারতীয় কমিটি। সেই সঙ্গে ২৫ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩ নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কে পি বসু মেমোরিয়াল হলে এআইডিএসও কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে সাধারণ কর্মীসভায় এ কথা জানান সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। তিনি জানান, ২৩ জানুয়ারির মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য স্তরে স্তরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি চলছে।

# কলমকে বড় ভয় শাসকদের

*একের পাতার পর*

বিজেপি সরকারের আনা সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এখন সারা ভারতের সবচেয়ে অগ্রণী শিক্ষাবিদ-বিজ্ঞানীরা রুখে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন, পথে নেমেছেন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকেই একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করে একের পর এক বেপরোয়া পদক্ষেপ নিয়ে জনস্বার্থকে দুপায়ে মাড়িয়ে চলেছে। এক দিকে নিত্য-নতুন আইন এনে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে তারা কেড়ে নিচ্ছে, অন্য দিকে দেশের অধিকাংশ সম্পদ, জনসাধারণের শ্রম ও অর্থে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা-সংস্থা সব কিছু নির্বিচারে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। শ্রম-শোষণ অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। কর্মসঙ্কোচন মারাত্মক আকার নিয়েছে। এই নীতির ফল হিসাবেই একচেটিয়া পুঁজির মুনাফা আজ আকাশ ছুঁয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী-সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বারুদের মতো জমা হচ্ছে। কিন্তু সরকারি ক্ষমতায় থাকা কিংবা ক্ষমতা দখলের আশায় থাকা বিরোধী দলগুলি পুঁজির স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে শোষিত মানুষের পক্ষে কোনও আন্দোলন গড়ে তুলতে রাজি নয়। নরেন্দ্র মোদিরা তাঁদের আগ্রাসী মেরুকরণের রাজনীতির মধ্যে বিরোধী রাজনীতির বড় অংশকেই যুক্ত করে ফেলেছেন। রাহুল গান্ধী থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সবাই ছুটছেন মন্দিরে মন্দিরে। কেউ হনুমান মন্ত্র জপ করছেন তো কেউ পৈতে বের করে ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ দিচ্ছেন।

তবুও শাসক বিজেপি জানে, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি যতই পুঁজির দাসত্ব করুক, সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বারুদে যে-কোনও সময় আগুন লাগতে পারে। সরকার জানে, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা যে স্বৈরাচারী আক্রমণ নামিয়ে আনছে তার বিরুদ্ধে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পাশাপাশি চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের শক্তি যুক্ত হলে প্রতিবাদের শক্তি বেড়ে যাবে বহুগুণ। দেশজুড়ে এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে। তাই উদ্বিগ্ন শাসক শ্রেণির লক্ষ্য চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী তথা নাগরিকদের এই ভূমিকাকে দমন করা। আর জনচক্ষে সেই দমন-পীড়নকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে হলে তাঁদের গায়ে দেশবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, সমাজে বিকৃত মানসিকতা সৃষ্টিকারী প্রভৃতি যে কোনও একটা তকমা লাগিয়ে দেওয়া দরকার। তাই যে মাওবাদীদের অস্তিত্ব সারা ভারতে নগন্য, সেই মাওবাদী আতঙ্কের ভূতই তাঁরা বারবার ঝুলি থেকে বের করেন এবং সরকারের যে কোনও সমালোচকের গায়ে সেই তকমা লাগিয়ে দিতে চান। এবারও বিরোধী মতকে স্তব্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী সেই নিদানই হেঁকেছেন।

অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই প্রথম নন, এ জিনিস অতীতেও বারবার দেখা গেছে। কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করার সময়ে নাগরিক সংগঠনগুলিকে বিদেশি শক্তির মদত জোগানোর অভিযোগ করতেন। একদা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও নন্দীগ্রামে কৃষকদের প্রতিবাদ আন্দোলন দমন করতে 'আন্দোলনে মাওবাদীরা আছে' বলে মিথ্যা প্রচার করেছিলেন।

বাস্তবিক প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বুদ্ধিজীবীদের, চিন্তাশীল নাগরিকদের প্রতি সরাসরি হুমকি ছাড়া কিছু নয়। একই সঙ্গে এই হুমকি দেশের সচেতন প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি— বেশি ভেবো না, বেশি বোলো না, বেশি প্রতিবাদ কোরো না। করলেই দেশদ্রোহী কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী তকমা লাগিয়ে জেলে ভরে দেবো। আমার হাতে পুলিশ-প্রশাসন-গোয়েন্দা, সামরিক-আধাসামরিক বাহিনী রয়েছে। এমনকি কোর্টের রায়ও আমি প্রভাবিত করতে পারি (বিলকিস বানোর ধর্ষণকারীদের মুক্তি)। এই শাসকরা আজ সরকার বিরোধিতাকেই দেশবিরোধিতা প্রতিপন্ন করছে।

দেশে পুঁজির মারাত্মক কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। এক শতাংশ পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত হয়েছে দেশের ৭০ শতাংশ সম্পদ। স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্রও আরও বেশি করে পুঁজির লেজুড়বৃত্তি করছে। একচেটিয়া পুঁজিই সংসদীয় দলগুলির খরচ জোগাচ্ছে। তাই কোথায় কারা সরকারে থাকবে, কারা মন্ত্রী হবে, কোন দপ্তরের মন্ত্রী হবে সবই পুঁজিমালিকরা ঠিক করে দিচ্ছে। লোকসভা আর বিধানসভা আজ জনসাধারণকে প্রতারণার মঞ্চে পরিণত হয়েছে। সেখানে যে সব আইন তৈরি হয় তা পুঁজির স্বার্থকে নিশ্চিত করতেই। এই অবস্থায় ক্রমাগত প্রচারের দ্বারা তারা প্রতিপন্ন করতে চায়— পুঁজির স্বার্থ, পুঁজিপতিদের স্বার্থ মানেই দেশের স্বার্থ, পুঁজিপতিদের পুঁজির বৃদ্ধি মানেই দেশের সমৃদ্ধি— তা দেশের শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের জীবনের বিনিময়ে হলেও।

কিন্তু শাসকরা এ-ও জানে, শোষণে জর্জরিত দেশের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ মিথ্যার আড়ালে থাকা সত্যকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। সে ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের, সমাজের চিন্তাশীল মানুষদের ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শাসকদের ভয় কলমকে, ভয় যুক্তিকে, ভয় নতুন ভাবনাকে, স্বাধীন চিন্তাকে। সেই স্বাধীন চিন্তাকে দমন করার জন্যই প্রধানমন্ত্রীর নিত্য-নতুন নিদান।

আসলে শাসকদের দরকার বুদ্ধিজীবীর নামে একান্ত অনুগত একদল বিচার-বুদ্ধিহীন স্তাবক তৈরি করা, যারা সহজেই ক্ষমতার দাসত্ব মেনে নেবে। বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকরা যতক্ষণ জনবিচ্ছিন্ন তথাকথিত বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেন ততক্ষণ শাসকের অসুবিধা থাকে না। তাদের পুরস্কার দিয়ে, নানা আনুকুল্য দিয়ে ভরিয়ে রাখে তারা। কিন্তু সাধারণ মানুষের লড়াই-আন্দোলনের পাশে দাঁড়ালেই বুদ্ধিজীবীরা দেশের শত্রু বনে যান। তাই সামগ্রিক ভাবে সমস্ত সচেতন নাগরিকই প্রধানমন্ত্রীর এই আক্রমণের লক্ষ্য।

## জীবনাবসান

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর জেলা পার্টিকর্মীদের অভিভাবকে পরিণত কমরেড চন্দ্রনাথ মহাপাত্র ৩০ অক্টোবর মেছেদার পপুলার নার্সিংহামে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। যৌবনে কলকাতার তিলজলা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সিপিআই দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৮৮ সালে অবসর গ্রহণের পর মেদিনীপুর জেলার বৈকুণ্ঠপুরে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন। বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'লেনিন ভবন'। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এস ইউ সি আই (সি)-র স্থানীয় কর্মীদের সাথে পরিচিত হন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণগুলি এবং দলের মুখপত্র গণদাবী অত্যন্ত মনোযোগের সাথে নিয়মিত পড়তে থাকেন। দলের জেলা নেতাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। একনিষ্ঠ পড়াশোনা ও আলাপ-আলোচনায় তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের দ্বারাই এ দেশে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব হবে। যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বে যে দলকে সমর্থন করেছিলেন সেই সিপিআই ত্যাগ করে এই দলে মনপ্রাণ ঢেলে নিজেকে সমর্পণ করেন। দলের নেতাদের প্রতি তাঁর মান্যতা ও গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

দল পরিচালিত গণআন্দোলনগুলি সম্পর্কে তিনি যেমন উৎসাহী ছিলেন, তেমনই মার্ক্সবাদী তত্ত্বচর্চাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। কর্মীদেরও তত্ত্বচর্চায় উৎসাহ দিতেন। এক্ষেত্রে কর্মীদের অনীহা দেখলে নেতাদের কাছে উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করতেন। দলের কাজকর্ম, নতুন যোগাযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ রাখার পাশাপাশি প্রতিটি কর্মসূচিতে আর্থিক সাহায্য দিতে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ।

সামাজিক কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল স্বতোৎসারিত। নিজের বাড়িতে নিজ ব্যয়ে ছাত্রদের রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। পার্শ্ববর্তী হাইস্কুলে ল্যাবরেটরির উন্নয়নে অর্থ সাহায্য করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার জন্য মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করতেন। স্কুলছাত্রদের পড়াশোনায় সাহায্যের উদ্দেশ্যে বাসুদেবপুর গ্রামে পাঠ্যপুস্তকের পাঠাগার 'যুগের আলো' নির্মাণ করেন। এই পাঠাগার-ভবন এবং তাঁর বাসভবন তিনি মহৎ কাজের জন্য দান করেছেন। এলাকায় মার্ক্সবাদের চর্চা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে লেনিন ভবনেও তিনি একটি পাঠাগার চালু করেন। জনসাধারণের মধ্যে মার্ক্সবাদের তত্ত্ব সহজভাবে তুলে ধরবার জন্য 'মার্ক্সবাদের বর্ণপরিচয়' নামে একটি ছোট পত্রিকা তিনি নিয়মিত ছাপতেন ও বিতরণ করতেন। লেনিন ভবনে হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করেন।

সরল অনাড়ম্বর ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা ছিল তাঁর। শেষ বয়সে শারীরিক শৈথিল্য সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কোনও দুঃখ-ক্ষোভ তাঁর ছিল না। এস ইউ সি আই (সি)-র স্থানীয় নেতা-কর্মীরা পরমাত্মীয়ের মতো তাঁকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

নিজের প্রশংসা তিনি শুনতেই চাইতেন না। এ দেশের বিপ্লবের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই প্রায়ই আক্ষেপ করতেন— "যখন শরীরে শক্তি ছিল, জীবনের সেই মূল্যবান বছরগুলো ভুল বিচারের ফলে সঠিক বিপ্লবী দল চেনা হল না, সাহায্য করা হল না। এটাই আমার সবচেয়ে বড় আক্ষেপের, বড় ব্যথার।"

কমরেড চন্দ্রনাথ মহাপাত্রের মরদেহ হাসপাতাল থেকে বৈকুণ্ঠপুর নিয়ে যাওয়ার পথে মেছেদায় এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা অফিসে আনা হয়। সেখানে দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসুর পক্ষে মরদেহে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রণব মাইতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অনুরূপা দাসের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। এছাড়াও উপস্থিত জেলা কমিটির সদস্য ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

তাঁর মৃত্যুতে দল বিজ্ঞানমনস্ক, উদারচেতা, নিপীড়িত মানুষের বন্ধু, বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক মহৎ চরিত্রের মানুষকে হারাল।

**কমরেড চন্দ্রনাথ মহাপাত্র লাল সেলাম**

# আদানির স্বার্থরক্ষায় একজোট সিপিএম-বিজেপি

*একের পাতার পর*

খেটে-খাওয়া মানুষ, মাছ ধরা যাদের একমাত্র পেশা। সংলগ্ন সমুদ্রের জলভাগটিও নানা ধরনের মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর সম্ভারে সমৃদ্ধ। ভারত মহাসাগরের সবচেয়ে দীর্ঘ প্রবাল প্রাচীরটিও রয়েছে এই অঞ্চলেই। ভিজিঞ্জামের তীরভূমিটি সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে আগে থেকেই ঘোষিত। এখানে বন্দর তৈরি হলে এলাকার মৎস্যজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার পাশাপাশি সম্পূর্ণ জীববৈচিত্র্যটিই বিপন্ন হবে। এই আশঙ্কা থেকেই পথে নেমেছেন এলাকার ৪০টি গ্রামের হাজার হাজার মৎস্যজীবী, রুখে দাঁড়িয়েছেন বহু পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ। একটানা গত তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। অথচ আদানির মুনাফার স্বার্থে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিপন্ন করে ভিজিঞ্জামেই বন্দর গড়তে বদ্ধপরিকর কেরালার সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার।

কী বলছেন আন্দোলনকারীরা? ‘ইন্টারন্যাশনাল ওসান ইন্সটিটিউট’-এর প্রাক্তন বিজ্ঞানী বিজয়ন জোসেফ বলেছেন, এই অঞ্চলে উপকূলভাগের ভূমিক্ষয় গত ’৭০-এর দশক থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু ২০১৫ সালে ভিজিঞ্জামে বন্দরের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে সমুদ্র যেন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে ভূভাগ গ্রাস করছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৪০টি গ্রাম সমুদ্রের গ্রাসে চলে যেতে শুরু করেছে। সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেছে বিখ্যাত শাংগুমুখম বিচ। কোভালাম, ভালিয়াথুরা ইত্যাদি বিচগুলির অস্তিত্বও সংকটের মুখে। আদানি গোষ্ঠী বন্দরের প্রয়োজনে যে ব্রেকওয়াটার বা সমুদ্রপ্রাচীর তৈরি করা শুরু করেছে, তার ফলে সমুদ্রস্রোতের দিক পরিবর্তন ঘটছে। উত্তাল হয়ে উঠছে সমুদ্র। ফলে প্রকল্প এলাকা জুড়ে উপকূলভাগ ধসে পড়ছে। এলাকার বাসিন্দা ৬০০-র বেশি মৎস্যজীবী গরিব মানুষ ইতিমধ্যে নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়েছেন। ত্রাণশিবিরে, গুদামঘরে আশ্রয় জুটেছে তাঁদের।

শুধু এটুকুই নয়। ভিজিঞ্জামে বন্দর তৈরি হলে মৎস্যজীবীপ্রধান এই অঞ্চলের মানুষের রুজির উপর কোপ পড়বে। গরিব মৎস্যজীবীরা স্বাধীন ভাবে মাছ ধরতে পারবে না। মাছ ধরার ছোট নৌকো শুধুমাত্র আদানি কোম্পানির নির্দিষ্ট করে দেওয়া এলাকাতেই নোঙর করা যাবে চড়া মূল্যের বিনিময়ে। ধ্বংস হবে প্রায় ৬০ হাজার দরিদ্র মৎস্যজীবীর জীবন-জীবিকা। সমুদ্রপ্রাচীরের কারণে উত্তাল হয়ে ওঠা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ইতিমধ্যেই আগের চেয়ে অনেক বেশি করে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের। গত এক বছরে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে বেশ কয়েকজন মৎস্যজীবীর।

‘ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্থ সায়েন্স স্টাডিজ’-এর গবেষক ডঃ কে ভি থমাস মন্তব্য করেছেন, ‘‘এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বাসিন্দাদের জীবন-জীবিকার ওপর এই বন্দরের কী প্রভাব পড়বে, তা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে খতিয়ে দেখেনি সরকার। ভিজিঞ্জামের ভূমিক্ষয়প্রবণ উপকূলে বন্দর নির্মাণের এই সিদ্ধান্ত সরকারের অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়’’। আগামী দিনে বন্দরের কাজের জন্য সমুদ্রপ্রাচীরগুলির নির্মাণ শেষ হলে গোটা এলাকার উপকূলভাগ আরও ভয়ঙ্কর ক্ষতির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

এই পরিস্থিতিতে বন্দর নির্মাণ বন্ধ করা, উচ্ছেদ হওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়া, উপকূল অঞ্চলে ভূমিক্ষয় বন্ধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্ঘটনায় মৃত মৎস্যজীবীদের পরিবারগুলিকে সাহায্যদান সহ সাত দফা দাবিতে রাজ্যের সিপিএম সরকারের কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনায় বসেছেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু সিপিএম সরকার দরিদ্র মৎস্যজীবীদের দাবি মানতে রাজি নয়। ফলে মাসের পর মাস ধরে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মৎস্যজীবীরা এবং এলাকার সাধারণ মানুষ। তিরুবনন্তপুরমের সাথে ভিজিঞ্জামের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও বিমানবন্দরে যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করছেন বিক্ষোভকারীরা, সচিবালয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আগস্ট মাস থেকে চলা এই আন্দোলনের ১০০তম দিনে সমুদ্রের বুকে মাছ ধরার নৌকোয় আগুন ধরিয়ে প্রতিবাদ জানান মৎস্যজীবীরা। নৌকো দিয়ে সমুদ্রপথ অবরুদ্ধ করেও প্রতিবাদ জানান তারা। বন্দর এলাকার নির্মীয়মাণ গেট ভেঙে, প্রতিবাদকারীদের আটকানোর জন্য তৈরি পুলিশি ব্যারিকেড সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তাল বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন স্থানীয় মানুষ। কোভালামের মাছ ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ আমাদের বাঁচার লড়াই। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পিছু হটব না। কি ইউডিএফ, কি এলডিএফ সরকার বারেবারে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করেছে আমাদের। এর শেষ দেখে ছাড়ব।

ভিজিঞ্জামে বিশালাকৃতি বন্দর তৈরি করে আদানি গোষ্ঠীর বিপুল মুনাফা লুটের স্বার্থে রাজ্যের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ সহ পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের প্রতিবাদকে আমল দিতে রাজি নয় কেরালার সিপিএম সরকার। এমনকি এই আন্দোলন দমনে দক্ষিণপন্থী বিজেপির সঙ্গে নির্লজ্জ ভাবে হাত মেলাতেও দ্বিধা করেনি ‘বাম’ নামধারী সিপিএম। ১ নভেম্বর নানা হিন্দু সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক মিছিলে মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে স্লোগানে গলা মেলালেন সিপিএম-এর তিরুঅনন্তপুরম জেলা সম্পাদক ও বিজেপির জেলা সভাপতি। আন্দোলনের পিছনে বিদেশি অর্থের প্ররোচনা থাকার গুজব ছড়াচ্ছেন এই ভণ্ড বামপন্থীরা। এমনকি ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টিরও চেষ্টা করছেন সিপিএমের শিক্ষামন্ত্রী।

অথচ পূর্বতন ইউডিএফ সরকারের আমলে যখন আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে ভিজিঞ্জামে বন্দর গড়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তখন এই সিপিএম-ই তার বিরোধিতা করেছিল। এই বিশাল প্রকল্পটি বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করে দুর্নীতির ভিত্তিতে এই চুক্তি হয়েছে বলে শোরগোল তুলেছিল, শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছিল। বাস্তবিকই পিপিপি মডেলের এই বন্দর প্রকল্পে ব্যয়ের সিংহভাগই চাপানো হয়েছে জনসাধারণের কাঁধে। প্রকল্পটিতে আদানির বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ২ হাজার ৪৫৪ কোটি টাকা। বাকি ৫ হাজার ৭১ কোটি টাকা জনসাধারণের পকেট থেকে নিয়ে প্রকল্পে ঢালবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, ২০১৭-র সিএজি রিপোর্টও মন্তব্য করেছিল, আদানিকে নানা বিষয়ে ৪০ বছর ধরে ছাড় দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে, তাতে রাজ্যের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ হাজার ৬০৮ কোটি টাকা। সিএজি আরও জানিয়েছিল, বন্দর নির্মাণের জন্য যে টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল, তাতেও বহু ফাঁকফোকর আছে এবং গোটা চুক্তিটিই তৈরি হয়েছে রাজ্যের মানুষের পরিবর্তে শুধুমাত্র আদানির মুনাফার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে।

আদানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসাবে বিজেপি তার ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালন করছে। কিন্তু সিপিএম তার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে কেন? আসলে, মুনাফার লক্ষ্যে পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের প্রশ্নে তারা আজ একচেটিয়া মালিকদের প্রচারিত তথাকথিত উন্নয়নের তত্ত্বকেই সমর্থন করে। সমৃদ্ধির নামে, কর্মসংস্থানের নামে যে উন্নয়ন খেটে-খাওয়া মানুষের সর্বনাশ করে একচেটিয়া মালিকদের মুনাফার উন্নতি ঘটায়, সিপিএম সেই উন্নয়নের পক্ষেই ঢাক পেটায়।

অথচ এভাবে উন্নয়নের নামে গরিব মানুষের সর্বনাশের স্বরূপ তুলে ধরার কথা বামপন্থীদেরই। তাদেরই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা। বিপরীতে হেঁটে আজ সিপিএম নামক সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিটি বামপন্থাকে কেবলমাত্র নির্বাচনী স্লোগানে পরিণত করেছে। ক্ষমতার স্বার্থে লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে এভাবেই তারা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চাইছে। তাদের এই ভূমিকা আগেও দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে সরকারে থাকার সময়ে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনায়। কেরালায় ভিজিঞ্জাম বন্দর আদানিকে উপহার দেওয়ার ঘটনায় তাদের আসল চেহারা আরও একবার নগ্ন হয়ে গেল।

(তথ্যসূত্র ঃ দ্য ওয়্যার-২৪-৮-’২২, দ্য ফেডেরাল-২২-৮-’২২, হাফ পোস্ট-১২-১০-’২০, ইকনমিক টাইমস - ২৩-৫-’১৭)

## জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র উত্তর ২৪ পরগণায় হাবড়া লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী এবং এ আই কে কে এম এস-এর বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড গোপাল সর্দার ৪ অক্টোবর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্থানীয় কর্মীরা এবং হাবড়া লোকাল কমিটি ও জেলা নেতৃত্ব তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন ও তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান। কমরেড গোপাল সর্দার দলের বৈপ্লবিক চিন্তার সংস্পর্শে আসার পর থেকেই বামিহাটি অঞ্চলে খেতমজুর ও গরিব মানুষদের মধ্যে কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের সংগঠিত করেন। তিনি নিজে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। অভাব ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তিনি প্রায় চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে হাবড়া অফিসে নিয়মিত সাপ্তাহিক পার্টি-ক্লাসে আসতেন। অভাব-অনটন সত্ত্বেও দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে কখনও অবহেলা করতে দেখা যায়নি। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি অসুস্থ শরীরে কৃষক ও খেতমজুরদের দাবি নিয়ে স্থানীয় স্তরে গণ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন। দলের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আনুগত্য ছিল গভীর। ১৭ অক্টোবর বামিহাটিতে এলাকার কর্মীদের উদ্যোগে এবং ২২ অক্টোবর উত্তর হাবড়া প্রাইমারি স্কুলে হাবড়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে কমরেড গোপাল সর্দারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। হাবড়ার সভায় সভাপতিত্ব করেন বারাসাত-বনগাঁ সংগঠনিক জেলা ইনচার্জ কমরেড তুষার ঘোষ। প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ তাঁর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

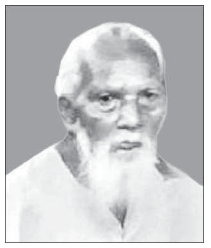

তাঁর মৃত্যুতে দল এক নিষ্ঠাবান ও আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে হারাল।

**কমরেড গোপাল সর্দার লাল সেলাম**

# বহরমপুরে ডেঙ্গু রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

রাজ্যের অন্যান্য জেলার সাথে পাল্লা দিয়ে মুর্শিদাবাদেও বেড়ে চলেছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। সম্প্রতি বহরমপুরে এআইএমএসএস-এর কর্মী অপর্ণা বিশ্বাসের ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়। একই পরিবারের ৪ জন আক্রান্ত, মৃত একজন। একই পাড়ায় ২০ জন আক্রান্ত। কিন্তু সরকার কোনও দায় নিতে নারাজ। যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে ডেঙ্গু মোকাবিলা করার দাবি নিয়ে ২১ অক্টোবর রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি ও বহরমপুর নাগরিক উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও বহরমপুর পৌরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সভাপতি কাবেরী বিশ্বাস, বিনয় মুখার্জী, তরুণ সাহা, মনোনীতা দাস, আবুল কালাম আজাদ, খুশবু খাতুন, নিরঞ্জন দাস, খাদিজা বানু প্রমুখ। উভয় প্রশাসন ডেঙ্গু মোকাবিলায় গুরুত্ব দিয়ে মোকাবিলার আশ্বাস দেয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24



# মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব স্মরণে

*৭ নভেম্বর মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৬তম দিবস দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে দেশ জুড়ে উদযাপিত হয়। দলের অফিস, সেন্টার এবং শহর ও গঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের ছবিতে মাল্যদান, দলের পতাকা উত্তোলন, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, বুক স্টল, ব্যাজ পরিধান, সভা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়। দলের শিবপুর সেন্টারে মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের ছবিতে মাল্যদান করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সল্টলেক সেন্টারে ছবিতে মাল্যদান করেন পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য (বাঁ দিকের ছবি)। দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ। কলকাতার এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড স্বপন ঘোষ ও পলিটবুরো সদস্য রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস ছায়া মুখার্জী, মানব বেরা, স্বপন ঘোষাল, অশোক সামন্ত সহ নেতা-কর্মীরা।*

## টেট আন্দোলনকারীদের সংবর্ধিত করল ছাত্র-যুবরা

হবু শিক্ষকদের অবস্থানের ৬০০ তম দিন ৪ নভেম্বর এ আই ডি ওয়াই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জী, রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং এ আই ডি এস ও-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মিজানুর মোল্লার নেতৃত্বে ছাত্র-যুবরা কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে মিছিল করে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অবস্থানরত আন্দোলনকারীদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধিত করেন।

সংগঠন দুটি দাবি জানায়, মেধাতালিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিয়োগ করতে হবে এবং নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত সকলকে অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

## মেরিট লিস্টের সকলকে নিয়োগের দাবি এআইইউটিইউসি-র

মেরিট লিস্টে নাম থাকা সকল প্রার্থীদের শিক্ষক পদে নিয়োগ এবং অবৈধ নিয়োগে যুক্ত সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সমর্থন করে এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে হাজার হাজার প্রচারপত্র সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। ২৮ অক্টোবর গান্ধী মূর্তি ও মাতঙ্গিনী হাজরার পাদদেশের ৭টি ধর্না মঞ্চে রাজ্য সম্পাদক অশোক দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল যায়। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সকল আন্দোলনকারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

৬ নভেম্বর এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনিন্দ্য রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ৭টি ধর্না মঞ্চের নেতৃত্বের হাতে একটি চিঠি তুলে দেন।

## ‘দ্য গোল্ডেন বুক অফ বিদ্যাসাগর’-এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত

১৯৯১ সালে এ দেশের নবজাগরণের বলিষ্ঠতম প্রতিভূ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের শতবার্ষিকীতে এক মহা আকরগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল অল বেঙ্গল বিদ্যাসাগর ডেথ সেন্টিনারি কমিটি। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় ‘দ্য গোল্ডেন বুক অফ বিদ্যাসাগর’। ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশি ভাষাভাষী লেখক, গবেষকদের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ রচনার অধিকাংশ সংকলিত হয়েছিল তাতে। ছিল গুরুত্বপূর্ণ বহু ছবি ও তথ্য। কালের নিয়মে সে বই আজ অমিল। পথিকৃৎ সাংস্কৃতিক সংস্থা এই অভাব পূরণের তাগিদে উদ্যোগ নেয় গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের। পুরনো বইয়ের সংযোজনী হিসাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও সামান্য সংশোধন সহ পুনর্মুদ্রিত বইটি ৬ নভেম্বর ২০২২ প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল কুমার চ্যাটার্জীর হাত দিয়ে।

ভারত সভা হলের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গ্রন্থটির অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। তিনি এই বই প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মূল বইটির প্রধান সম্পাদক মানিক মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রেরিত বার্তায় বলেন, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প রুখতে বিদ্যাসাগরের চিন্তার চর্চা আজ খুব জরুরি। বিমল কুমার চ্যাটার্জী বই উদ্বোধন করে বলেন, এই বইটি বাংলার ঐশ্বর্য। বিদ্যাসাগরকে চিনতে হলে এই বই সংগ্রহ করা দরকার। সারা বাংলা বিদ্যাসাগর দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক কমল সাঁই বলেন, এই দেশে আজ আবার বিদ্যাসাগরের মতো চরিত্রের বড় প্রয়োজন। উপস্থিত ছিলেন পথিকৃৎ পত্রিকার অন্যতম পরিচালক স্বপন ঘোষাল। প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com